॥ মিথ্যাস্মৃতির ॥

শীলভদ্র

নিসর্গ মেরাজ চৌধুরী

মহাস্থবির
শীলভদ্র

নিসর্গ মেরাজ চৌধুরি

প্রান্তজনের কথা

নির্বাচিত অংশ- ১

পৃথিবী তার আদি ও গভীর অন্ধকারকে ডেকে এনেছে বেশ কিছুক্ষণ আগেই। ঘরের কোণে জ্বলতে থাকা প্রদীপটি তার প্রজ্বলিত আলোক শিখার মাধ্যমে আঁধারকে ঢাকার জন্য দারুণ ভাবে সচেষ্ট। এদিকে দখিনা বাতাস যেন মিত্রতা স্থাপন করেছে এই আঁধারি রাতের সাথে, ক্রমাগত আঘাত করে চলেছে প্রদীপের দীপ্তমান সলতেকে। কে কাকে পরাজিত করবে? এই আঁধারি রাত, যে এই বর্তমানে অবস্থান নিয়েছে চারপাশ জুড়ে। নাকি এই প্রদীপ, যে 'আমিই জয়ী ' ভাব নিয়ে নিজের ক্ষুদ্র আয়োজনে আপন অস্তিত্বকে ধরে রাখার চেষ্টা করছে।

বেশ কিছুক্ষণ এই অস্পর্শীয় রণাঙ্গনে চলল যুদ্ধ, অতঃপর হার মেনে নিতে হল প্রদীপটিকে। এর পর, সর্বত্র অন্ধকার, কালো নিকষ আঁধার রাত।

প্রদীপটি নিভে যাওয়ার সাথে সাথে বড়ো একটি দম ফেললেন দান্তে ভদ্র। অনেক্ষণ ধরে এই ঘরে বসে প্রদীপ

ও আঁধারের এক অস্পর্শীয় যুদ্ধকে অনুভব করে যাচ্ছিলেন তিনি। মনের মধ্যে এই কথাটাই প্রতিপাদ্য হচ্ছিল, জয় আঁধারেরই হবে, কারণ অন্ধকারই চির সত্য। এই কথাটি আজ দিনভর তাঁর মাথায় ভর করে ছিল। রাতের এই একাকী সময় দান্তে ভদ্রকে তাঁর যুক্তির সততায় যেন আরও বিশ্বাসী করে তুলেছে।

চাঁদহীন এই ঘুটঘুটে অন্ধকার রাতে, ঝিলমিল করে জ্বলতে থাকা তারা গুলোও যেন কোথাও হারিয়ে গেছে। অবশ্য এটা অনুমেয় ছিল, কারণ আজ সারা দিন আকাশ জুড়ে ছিল কালো মেঘের অবস্থান। সূর্য বা চাঁদ, যেই যার আলো প্রকাশের চেষ্টা করুক না কেন, তা ঢেকে দিতে মেঘেদের আগমন যেন আঁধারেরই জয়গান গেয়ে যাচ্ছে। দান্তে ভদ্র চোখ বন্ধ করে রেখেছেন, ধীরে ধীরে তিনি অনুভব করছেন তাঁর চারপাশকে। কেমন যেন স্থির, নীরব, শূন্যতায় পূর্ণ সব। চোখ খুলে তাকালেও যেন সেই শূন্যতা ঘিরে ধরে। এই শূন্যতার কি কোনো অস্তিত্ব আছে? কোনো কিছুই নেই বা কিছু থাকার মাঝামাঝিতে কি কোনো কিছুর অস্তিত্ব থাকতে পারে? যদি পারে তাহলে তা কী? যদি না পারে তাহলে এই আঁধারের অস্তিত্ব কোথায়?

এরকম বেশ কিছু প্রশ্নের মাধ্যমে তাঁকে জর্জরিত করার চেষ্টা করেছিলেন দক্ষিণ ভারতের বিদ্যান ব্রাহ্মণ ব্রত্যদেব। সেই পণ্ডিতের প্রশ্নের উত্তরে দান্তে বলেন, এই অবস্থাকেই

নির্বাচিত অংশ- ২

তাঁর কথা শেষ হওয়ার পর উপস্থিত সকলকে বিস্মিত করে দান্তে ভদ্র সামনে এগিয়ে এসে হাঁটু ভেঙে নমস্কার করে বসলেন। ধর্মপালের পায়ের দিকে চোখ রেখে পরম ভক্তির সুরে বললেন, হে আচার্য, আপনার সাথে বেশ কিছু আলোচনা সভায় যোগদানের সুযোগ হয়েছিল আমার। যার জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ। সেসব সভা থেকে বিতর্কের কায়দা কানুন নিয়ে বেশ ভালোভাবেই দীক্ষা দিয়েছেন আমাকে। তাই এবার আপনার কাছে একটি আকাঙ্ক্ষা নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। ধর্মপাল তার দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে রইলেন। অন্যরাও বেশ উৎকণ্ঠিত। দান্তে বললেন, মহাত্মন আপনার অনুমতি পেলে আমি নিজে এই ধর্মতর্কে অবতীর্ণ হতে চাই।

দান্তের কথায় যেমন পুলকিত হলেন, তেমনি আনন্দিতও হলেন আচার্য ধর্মপাল। তাঁর প্রিয় ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম দান্তে ভদ্র। উপস্থিত সবার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন,

প্রতিভাবান ব্যক্তির জন্য আমার সম্মান কখনওই কমে না, দান্তে তেমনি একজন। তার নবীন জ্ঞানের মাধুর্যতার কাছে অনভিজ্ঞতা ম্লান। আমি নিশ্চিৎ দান্তে যদি তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হয় তাহলে অনায়াসে সেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে পরাজিত করতে সক্ষম হবে। তাহলে এবার মগধ রাজার কাছে দান্তে ভদ্রকে নিয়ে যাচ্ছি।

ধর্মপাল যথা সময়ে তার প্রিয় শিষ্যকে নিয়ে চললেন মগধের পথে। পদব্রজে চলতে চলতে নানান বিষয়ে দান্তের মেধার শাণিত ধার উপলব্ধি করলেন তিনি। মগধের রাজসভায় যখন উপস্থিত হলেন, মহারাজ মহা আনন্দে আচার্যকে বরণ করে নিলেন। ধর্মপাল তাকে জানালেন, এবার তিনি নন, তাঁর শিষ্য দান্তে ভদ্র এই তর্ক যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে।

মহারাজ মনঃক্ষুণ্ন হলেন, কারণ তিনি চেয়েছিলেন মহাজ্ঞানীদের তর্ক। এমন নবীন ছাত্রের সাথে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের তর্কযুদ্ধ তাঁর আয়োজনের বিশালতাকে যেন ম্লান করে দিচ্ছে। মহারাজের মনের কথা বুঝতে পেরে আচার্য বললেন, আমার এই শিষ্য আমার জ্ঞানের প্রতিচ্ছবি বহন করছে। যদি সে পরাজিত হয় তাহলে সবাই জানবে আমি ধর্মপাল পরাজিত হয়েছি। আমি জানি এবং বিশ্বাস করি, দান্তে ভদ্র সেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে পরাজিত করতে পারবে। রাজভবনের সাথেই লাগোয়া সভামণ্ডপে তর্কযুদ্ধের

আয়োজন করা হয়। মহারাজ নিজে বেশ আয়েশ করে বসেছেন, সাথে তার অমাত্যগণ। তাছাড়া অনেক বিদ্যান লোকের সমাগম ঘটেছে। সবার ধারণা, এবার আচার্য ধর্মপাল পরাজিত হতে চলেছেন। কারণ, সাদা ধবধবে চুল, সাথে সাদা পোশাক-পরিহিত ব্রত্যদেব দারুণ বেশভূষায় উপস্থিত হলেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল কোনো জ্যোতির্ময় ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর জ্ঞানের ঝুড়ি যেন তার শুভ্র চুলের মতোই পরিপক্ক, উদ্ভাসিত। অপর পাশে শীর্ণকায় শরীরে, গেরুয়া পোশাকে দান্তে ভদ্র যেন সৌম্যতার প্রতীক। তারুণ্যের চাঞ্চল্যের মধ্যেও নিজের সংযম বজায় রেখেছেন তিনি।

মহারাজ নিজে দাঁড়িয়ে উপস্থিত সকলের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন দুই পক্ষকে। শুরু হলো তর্কযুদ্ধ। প্রথমেই বক্তব্য রাখেন ব্রত্যদেব। বৌদ্ধমত খণ্ডন করে ব্রাহ্মণ মতকেই জগতের শ্রেষ্ঠ মত ঘোষণা দেন তিনি। তাঁর দীর্ঘ বক্তব্যে বৌদ্ধ আচার-অনুষ্ঠান, মতপার্থক্য, মতবাদে বেদের উদাহরণ টেনে বিভিন্ন প্রশ্নের অবতারণা করেন তিনি। বৌদ্ধ বিশ্বাসের বিপক্ষে এমন সব যুক্তি তুলে ধরেন, যা উপস্থিত সকলের মধ্যে আগ্রহ তৈরি করে অপর পক্ষের উত্তর শোনার আশায়।

দান্তে যখন উঠে দাঁড়ালেন তখন পুরো সভা জুড়ে একটি গুনগুন শব্দ শোনা গেল, এই ছেলে পারবে তো? দান্তে

ব্রত্যদেবের সবগুলো যুক্তি গভীর মনোযোগে শুনছিলেন। এরপর জ্ঞানের গভীর থেকে একে একে সব যুক্তির খণ্ডন করে চললেন অবলীলায়। সভায় যে গুনগুন্ শব্দ হচ্ছিল তা ধীরে ধীরে স্তিমিত হতে থাকল। কিছু কিছু উত্তরে স্বয়ং ধর্মপাল আশ্চর্যিত হয়ে গেলেন। তর্কের এক পর্যায়ে ব্রত্যদেব দান্তে ভদ্রকে 'নির্বাণ ' নিয়ে প্রশ্ন করেন। উত্তরে দান্তে ভদ্র বলেন, এটা হল 'শূন্যতার উপলব্ধি'।

মনে মনে এই উত্তরটিই আশা করছিলেন ব্রত্যদেব। উচ্চস্বরে হাসি দিয়ে বললেন, শূন্য? যাদের মুক্তির পথই হল শূন্য, গন্তব্য শূন্য, তার সাথে আর কীইবা তর্কের খেলা?

ব্রত্যদেব আত্মগর্বে উচ্ছ্বসিত হয়ে রাজার দিকে তাকিয়ে বললেন, শূন্যতার মধ্যে যে মুক্তি পায় সে তো বিনাশবাদী, এর থেকে কি এই মানবসমাজ, সভ্যতা, এই জগতের মঙ্গল হতে পারে? আমি মনে করি, যার গন্তব্য শূন্য সে কাউকে শান্তির পথ দেখাতে পারবে না। আমার মতে যে ধর্মমত মানুষকে কল্যাণের পথ, মুক্তির পথ দেখাতে পারে না, পারে শুধু শূন্য দেখাতে সে ধর্মমত সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

ব্রত্যদেবের বিদ্রুপাত্মক হাসি আর সূক্ষ্ম কথার জালে সবাই নড়েচড়ে বসলেন। মগধরাজ ধরেই নিলেন এই তরুণ তার্কিক ব্রত্যদেবের কথার জালে আটকা পড়ে গেছে, সে আর উত্তর দেবার মতো কোনো কথা পাবেনা।

সভা মণ্ডপের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন আচার্য ধর্মপাল। হাতের ইশারায় চেষ্টা করছিলেন দান্তে ভদ্রকে কিছু বোঝানোর। কিন্তু দান্তে কারও দিকেই তাকালেন না। অনেকক্ষণ চুপ করে ভাবতে থাকলেন, চোখ বন্ধ করে নিজের ভেতরের সত্ত্বার সাথে যোগাযোগ স্থাপন করলেন তিনি। মহারাজ জানতে চাইলেন, তাঁর কি কিছু বলার আছে ? দান্তে অবিচলিত দৃষ্টিতে তাকালেন সামনের দিকে। মাথা নাড়িয়ে উত্তর দিলেন, তাঁর বলার আছে, তিনি প্রস্তুত। শিরদাঁড়া শক্ত করে দাঁড়িয়ে ধীর লয়ে ভারী কণ্ঠে বললেন, নির্বাণ মুক্তিরই একটি বিশেষ রূপ। এই নির্বাণের অর্থ হল 'কিছুই নেই '। যদি অস্তিত্ব নেই হতে পারে তাহলে অস্তিত্বহীনতাও নেই, যদি আছে বলতে কিছু না থাকে তাহলে নেই বলতেও কিছু নেই।

নির্বাণ হলো অব্যক্ত, অনির্বচনীয়, তৃষ্ণার বিনাশ। নির্বাণ সেই অবস্থা যেখানে জন্ম নেই, জরা নেই, ব্যাধি নেই, ব্যক্তি নেই, শোক নেই, নেই মৃত্যু। সেখানে চাঁদ-সূর্য নেই আবার নেই অন্ধকারও। যেখানে সরোবরের স্রোত বাধা পেয়েছে, থেমে গেছে। তেমনি এক পরম অবস্থাই হল নির্বাণ।

দান্তের উত্তর শুনে সভায় উপস্থিত সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেল। ব্রত্যদেব এমন উত্তরে বিস্মিত। বলে উঠলেন, এমন কিছু যে আমার চিন্তারও অতীত। দান্তে সাথে সাথে বলে

উঠলেন, যা আমাদের চিন্তার ঊর্ধে তাকেই আমরা শূন্যতা বলি। এই শূন্যতা আমাদের জ্ঞানের শূন্যতা। নির্বাণের অর্থ বুঝতে হলে জ্ঞানের শূন্যতাকে অনুভব করতে হবে। দান্তে ভদ্রের কথা শেষ হবার সাথে সাথে মহারাজ আনন্দে দাঁড়িয়ে গেলেন। তর্কযুদ্ধে এমন দারুণ ভাবে ফিরে এসে প্রশ্নকর্তাকে নিজের প্রশ্নে জর্জরিত করা যে চাট্টিখানি কথা নয়। এমন দৃশ্য সহজে দেখা যায় না। ব্রত্যদেব আর কিছু বলার ভাষা পেলেন না।

নির্বাচিত অংশ-৩

নিরুমণিকে দেখে স্মিত হাসি দিলেন শীলভদ্র। তাকে চিনতে পেরেছেন এটা ভেবেই সে আনন্দিত হয়ে উঠল। মানুষের ভিড়ে সামনে আসার সুযোগ হচ্ছিল না। তাই অপেক্ষা করতে থাকল। ভিড় একটু কমে আসলে নিরুমণি এগিয়ে গেল শীলভদ্রের দিকে। বলল, হে মুনিবর, আমার চিন্তায়, চেতনায়, গত কতদিন ধরে যে অস্থিরতা কাজ করছিল তার অবসান হল আজ। আপনার কাছ থেকে আরও কিছু শুনতে, শিখতে, জানতে মন উতলা হয়েছিল। আমি খুব খুশি হব যদি আজ আপনি আমার বাড়িতে খাবারের জন্য আসেন। আপনার সান্নিধ্যে এসে বুদ্ধকে আরও জানতে পারব, মনের অশান্তি, অপূর্ণতা ক্ষোভগুলোকে দূর করতে পারব।

শীলভদ্র আবারও হাসি দিলেন। তিনি বললেন, জ্ঞানের জন্য আমার অপেক্ষা কেন? এই জগৎ নিজেই জ্ঞানের আধার। ভাবতে হবে আপনি জ্ঞানের অন্বেষণে বের হবেন, নাকি নিজের মধ্যেই তাকে খুঁজে নেবেন। মনের

অশান্তি দূর করতে হলে আগে জীবনের গূঢ় সত্যকে নিজের ভেতর অনুভব করার চেষ্টা করুন। তখনই হয়তো খুঁজে পাবেন, শান্তি আপনার মধ্যেই বসবাস করছে।
তাঁর স্থির লয়ে বলে যাওয়া প্রতিটা শব্দ যেন নিরুমণিকে আরও কাতর করে দিচ্ছে দৃষ্টিতে শান্তির ছোঁয়া পাওয়ার জন্য। নিরুমণি আবারও শীলভদ্রকে নিমন্ত্রণ করল। অতঃপর শীলভদ্র বললেন, আগামী মাসে তার বাড়িতে যাবেন।

নিরুমণির নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে তার বাড়ি গেলেন শীলভদ্র। কিন্তু জানতে পারলেন নন্দদেব বাড়িতে নেই। শীলভদ্র নিরুমণিকে বললেন, আজ নয়, আবার আসবেন তিনি যখন নন্দদেব থাকবেন। নিরুমণি অনেক অনুনয় করে বলে, অতিথি তার বাড়ি এসে খালি মুখে ফিরে গেলে পাপ হবে। শীলভদ্র বললেন, তিনি বাড়ির ভেতর প্রবেশ করবেন না। দরোজার পাশে বসেই খাবার গ্রহণ করবেন। নিরুমণি তাঁর ইচ্ছাই মেনে নিল। বাড়ির ভেতর থেকে একে একে বিভিন্ন পদের খাবার এনে দিল। বিমুগ্ধ চোখে দেখতে থাকল শীলভদ্রের খাবার গ্রহণ। নিজের মনের ভেতর তীব্র আবেগ অনুভব হচ্ছে নিরুমণির। যেন বহুকাল ধরে বাঁধা পড়ে যাওয়া মনের চঞ্চলতা আজ বাঁধনহীন হতে চাচ্ছে। খাবার গ্রহণ শেষে শীলভদ্র বিদায়

নিতে চাইলে নিরুমণি বলল, হে জ্ঞানেশ্বর, আপনার কাছে কিছু জানার ছিল।

শীলভদ্র তার দিকে তাকালেন। নিরুমণি একটু সাহস নিয়ে বলল, উষ্ণতা ও শীতলতার পার্থক্য কি শুধু স্পর্শে?

শীলভদ্র কিছু বললেন না, তার মনে হলো প্রশ্নটি অবান্তর অথবা ভেতরে অন্য কিছু আছে।

নিরুমণি আবার বলল, যে শীতল হতে চায় তার জন্য কি শীতলতার স্পর্শ পাওয়াই কাম্য নয়?

শীলভদ্র নিরুমণির কথার অর্থ বোঝার চেষ্টা করলেন। ঘরের ভেতরে কুপির বাতিতে কিছুটা অস্পষ্টভাবে নিরুমণিকে দেখা যাচ্ছে। দিনের বেলায় কুপি জ্বালানো যেমন কাম্য নয়, তেমনি ঘরের সব জানালা বন্ধ থাকাটাও কোনো ভালো ইঙ্গিত দিচ্ছে না। মনের কোথায় যেন অশনি সংকেত পাচ্ছেন তিনি।

শীলভদ্রের নিশ্চুপতায় বাধা দিল নিরুমণি। আবার বলল, আমি প্রশান্তির শীতলতা অনুভব করতে চাই। আমি চাই আপনি আমাকে স্পর্শ করুন, আমাকে শীতল করুন।

হতচকিত হলেন শীলভদ্র। যদিও তাঁর চেহারায় তা প্রকাশ পেল না। নিরুমণি তার গায়ে পেঁচিয়ে থাকা শাড়ির আঁচল ফেলে দিল, উন্মুক্ত বক্ষে সে যেন আহ্বান করছিল শীলভদ্রকে। গত কত দিন ধরে জমতে থাকা আবেগ, কল্পনায় বিমোহিত চিত্ত ধীর লয়ে যে ভালোবাসার সৃষ্টি

করেছিল তার মনে, আজ যেন তা প্রকাশ পেতে দ্বিধা করল না।

শীলভদ্র শান্ত স্বরে বললেন, যে শীতল হতে চায় সত্তার উন্মেষের জন্য, তার স্পর্শের দরকার নেই।

এরপর শীলভদ্র স্থির চোখে তাকালেন নিরুমণির দিকে। তাঁর এই নির্লিপ্ত চাহনি নিরুমণির অস্থির চিত্তকে সংকুচিত করে দিল। তীব্র এক লজ্জাবোধ তাকে গ্রাস করল। তার চোখে তাকিয়ে শীলভদ্র বললেন, মায়া, মোহ আর বিশ্বাসের অপূর্ব মিলনেই আছে এই মানবজাতির প্রশান্তি। যে আপনাকে বিশ্বাস করে, তার প্রতি বিশ্বস্ত হন। আপনার মায়া সেই বিশ্বাসের সাথে যোগ করুন, প্রশান্তি সেখানেই। মায়া আর বিশ্বাসকে বিপরীত দিকে রাখবেন না। তাহলে মায়া সৃষ্টি করবে ছলনার। আর ছলনা উৎসাহ দেবে রিপুকে, যা জালের মতো পেঁচিয়ে রাখবে। সে জালে যে পড়বে তার মুক্তি সংকুচিত হতে থাকবে, নিয়ত সংসারের চিরায়ত অশান্তির জাল তাকে গ্রাস করবে। তাই বিশ্বাস, মায়া-মোহকে একই দিকে প্রবাহিত করুন।

নির্বাচিত অংশ-৪

একজন সেনাপতি থেকে একটি রাজ্যের মহারাজ। শশাঙ্কের উত্থান ছিল অত্যন্ত চমকপ্রদ ও বিস্ময়কর। তাঁর সমকালীন অন্যান্য রাজাদের মধ্যে শশাঙ্কের এই উত্থান যেন অজানা অশনি সংকেত দিচ্ছিল। কীভাবে সম্ভব! এই বিস্ময় ধীরে ধীরে আতঙ্কিত করে তোলে সবাইকে।

গুপ্ত রাজা মহাসেন গুপ্তের সৈন্যদলের একাংশের প্রধান পরে সেনাপতির পদ গ্রহণ, ক্ষয়িষ্ণু গুপ্ত রাজবংশের অযোগ্য শাসন শশাঙ্ককে উচ্চাভিলাষী করে তোলে। পরিকল্পনা নিতে থাকেন নিজেকে রাজা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্ন বাস্তবায়নের। অল্প সময়ের মধ্যেই তাম্রলিপির কাছে কর্ণসুবর্ণে নিজেকে সামন্তরাজা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। ছলচাতুরী তাঁর সবচেয়ে বড়ো সম্পদ, সেই চতুরতার আশ্রয় নিতে কখনওই দ্বিধা করেন না তিনি। মহারাজ মহাসেন গুপ্তের কাছে অনুনয় করে বলেন, মহারাজ, রাজ্যের সেনাপতি হিসেবে আপনার কাছে অনুরোধ নিয়ে এসেছি। এই রাজ্য এখন ঘোর সংকটের মুখোমুখি,

চারদিকে বিদ্রোহ। শোনা যাচ্ছে বঙ্গ, সমতট, মৈথেলীর রাজারা আমাদের বিভিন্ন অংশ দখল করে নিচ্ছে। তাই আমাদের দ্রুত সামন্তরাজাদের শক্তিশালী করা প্রয়োজন। মহারাজ তখনও অজ্ঞাত শশাঙ্কের দুরভিসন্ধি নিয়ে। তিনি বললেন, সেটাই তো জরুরি, আপনি পরিকল্পনা বলুন, কী করা যায়।

এমন কিছু শোনার অপেক্ষায় ছিলেন শশাঙ্ক। বলে উঠলেন, মহারাজ, নতুন একটি সামন্ত রাজ্য গড়ে তোলা দরকার। প্রাচীন পুন্ড্র নগরের আশপাশ জুড়ে,কর্ণসুবর্ণকে কেন্দ্র করে। সেই সামন্তরাজা আপনার অধীনে থেকে পুরো বঙ্গ সমতট নিয়ন্ত্রণ করবে। আর এমন শক্তিশালী সামন্ত রাজ্য আপনার অধীনে থাকলে মগধের দিকে কেউ আক্রমণের সাহস দেখাতে পারবে না।

বৃদ্ধ মহারাজ মহাসেন গুপ্ত দেরি করতে চাইলেন না। শশাঙ্কের পরিকল্পনা মতোই নতুন এক সামন্ত রাজ্য গঠনের উদ্যোগ নিলেন, যার রাজা হলেন শশাঙ্ক। মগধ সেনার বেশ কিছু অংশ তার নিয়ন্ত্রণে নিয়োজিত করে দিলেন। সামন্ত রাজা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে শশাঙ্ক আক্রমণ করেন বঙ্গের ছোটো বড়ো রাজ্যগুলোতে। তাঁর সৈন্যদের মধ্যে এসে পড়ে চঞ্চলতা। যেন হাজারো দিনের জড়তা কাটিয়ে উঠেছে তারা। যুদ্ধজয়, লুটতরাজ হয়ে ওঠে তাদের আনন্দ। সেই সাথে শশাঙ্ক গড়ে তুলতে

থাকেন ছোটো ছোটো সামন্ত রাজ্য যা সরাসরি তাঁর নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হতে থাকে। খাজনা জমা করেন নিজের রাজ্যকোষে। বড়ো অঙ্কের খাজনা দেন মহাসেন গুপ্তকে।

বৃদ্ধ মহারাজ যেন ধীরে ধীরে বুঝতে পারেন তার ভুল। তাই থানেশ্বরের রাজার অনুরোধে মালবে আক্রমণের জন্য নির্দেশ দেন শশাঙ্ককে। এই সিদ্ধান্ত যেন ঐশ্বরিক বর হয়ে ধরা দেয়। মালব রাজাকে ভীত সন্ত্রস্ত করেন তার শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে। কিন্তু গোপনে করে নেন মিত্রতার চুক্তি।

যখন শশাঙ্ক মালবে ছিলেন, তখন আরেকটি ভুল করেন মগধ রাজা মহাসেনগুপ্ত। নিজের বিশ্বস্ত কর্মচারী জয়নাগকে গৌড়ের শাসনকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেন। এ খবর পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন শশাঙ্ক। মগধ রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে গৌড়ের রাজপ্রাসাদ দখল করে নেন। জয়নাগের বাধা দেওয়ার মতো কোনো ক্ষমতাই ছিল না। সে শশাঙ্কের কাছে আত্মসমর্পণ করে প্রাণ ভিক্ষা চায়। কিন্তু রাজা শশাঙ্ক জানেন শত্রুকে বাঁচিয়ে রেখে শত্রুতা বাড়িয়ে রাখার দরকার নেই, তাই জয়নাগকে হত্যা করে গৌড়কে একটি স্বাধীন রাজ্য হিসেবে ঘোষণা করেন। সেই সাথে তাঁর গড়ে তোলা ছোটো ছোটো সামন্ত রাজ্যগুলোকে একীভূত করে বিস্তৃত করেন তাঁর রাজ্য

সীমানা। রাজধানী স্থাপন করেন কর্ণসুবর্ণতে। মগধের পাশেই গড়ে ওঠে নতুন এক স্বাধীন রাজ্য, গৌড় যার রাজা মহাসামন্ত শশাঙ্ক।

শশাঙ্কের দূরদর্শিতা তাঁকে বরাবরের মতোই সাফল্যের পথ দেখিয়েছে। তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা আর কূটনৈতিক চিন্তায় পারদর্শিতা তাঁকে গড়ে তুলেছে একজন সমীহ জাগানো রাজা হিসেবে। প্রজাদের মধ্যে জনপ্রিয় এই রাজা শিবের ভক্ত, হিন্দু ব্রাহ্মণদের ছিল তাঁর রাজ্যে বিশেষ স্বাধীনতা।

দূত মাধ্যমে মালবের রাজা দেবগুপ্তের আমন্ত্রণ পেয়ে পুরোনো মিত্রতাকে জোরদার করার ব্যাপারে আগ্রহী হন শশাঙ্ক। তিনি জানেন কনৌজ রাজা আর থানেশ্বরের রাজার মিত্রতা অন্য সব রাজ্যকেই চিন্তার মধ্যে ফেলেছে। এমন সময় কনৌজের অধীনস্থ রাজ্য মালবের রাজা দেবগুপ্ত তাঁর বন্ধুত্ব আশা করছেন কেন? দেবগুপ্তের কি তাহলে সুপ্ত বাসনা আছে কনৌজ বা থানেশ্বর আক্রমণের?

প্রকাশকের তরফে

তাহলে পাঠক, আজ এই পর্যন্তই থাক।

পুরো লেখাটির থেকে কিছু কিছু অংশ আপনাদের তুলে দিলাম। শীলভদ্রের লেখক বাংলাদেশের একজন অত্যন্ত নামী এবং ব্যস্ত সরকারি বিশিষ্ট চিকিৎসক। তাঁর কাজের চাপের জন্য, তিনি ইচ্ছে থাকলেও লিখে উঠতে পারেন না।

এই গোটা বইটিতে হয়ত আপনার বেশ কিছু জায়গা চোখে লাগতে পারে ভাষাগত কারণে। যতই এপার বাংলা এবং ওপার বাংলার ভাষা এক হোক, কোথাও কোথাও তার চলন এবং কথ্য আলাদা। আমরা বাংলাদেশ এবং তাঁদের ভাষার প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা জানিয়ে একেবারে এক-দুটি সামান্য জায়গা ছাড়া কিছু বদলাইনি, আমাদের মত করার চেষ্টা করিনি। বানান বিধি অনুসরণ করা হয়েছে বাংলা অকাদেমির।

মহাস্থবির শীলভদ্রকে কে দুলাইন লিখি, সে সাহস দেখানো আমার কাছে বাতুলতা। কিন্তু ভাই নিসর্গ এক অদ্ভুৎ মানুষ ততধিক অদ্ভুৎ তাঁর লেখার বিষয়।

তাঁর থেকে যে পরের পাণ্ডুলিপিটি আমার কাছে এসেছে সেটি হল চট্টগ্রাম লুণ্ঠনে মাষ্টারদার সাথে যে গোটা

নারীবাহিনী ছিলেন তা নিয়ে , যাঁদের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ মদত ছাড়া কোনোদিনও মাষ্টারদার পক্ষে সম্ভব ছিল না সেই যুদ্ধে জয় লাভ করা। কিন্তু তাঁরা আড়ালেই থেকে গেছেন, অন্ধকারে থেকে গেছেন।

আপনারা নিশ্চয়ই এতদিনে একটু বুঝেছেন, যে নিছক প্রকাশনা ব্যবসা করতে খোয়বনামা তৈরি হয়নি। অবশ্যই খোয়াবনামা একটা প্রকাশনা, তাকে তার বই বেচে টাকা তুলতে হয়। কিন্তু তার প্রধান এবং একমাত্র উদ্দেশ্য,নিজেদের অতীতকে ক্রমাগত খুঁড়ে চলা। সামর্থ্য খুবই নগণ্য হলেও নিজেদের অতীতের সেই অন্ধকার রাস্তা ধরে এক ছোট্ট আলোকবর্তিকা হয়ে ক্রমে এগিয়ে চলা...এগিয়ে চলা...এগিয়ে চলা।

এবং এই এগিয়ে চলায় আপনারাই যে মূল শক্তি সে বিষয়ে খোয়াবনামার কোন সন্দেহ নেই। তাই আপনাদের খোয়াবনামা নতমস্তকে গড় করে।

কারণ, আমরা জানি আপনারও আমাদের মতো হয়ত বিশ্বাস করেন, আমরা যদি আজ অতীতকে মনে না রাখি, তাহলে ভবিষ্যতেরও কোনও দায় নেই আমাদেরকে মনে রাখার।

যদি একবারের জন্যও মনে হয় আপনার নিকটজনকে এই পিডিএফটি শেয়ার করার দরকার, তা নির্দ্বিধায় আপনি শেয়ার করতে পারেন।

আমরা এও মনে করি—এ পৃথিবীতে জ্ঞানই একমাত্র নিত্য এবং সত্য। তার কোনও মৃত্যু নেই, বিনাশ নেই। বাকি সব অনিত্য।
হে পাঠক প্রণাম জানবেন।

টিম খোয়বানামা

খোয়াবনামার পরবর্তী বই

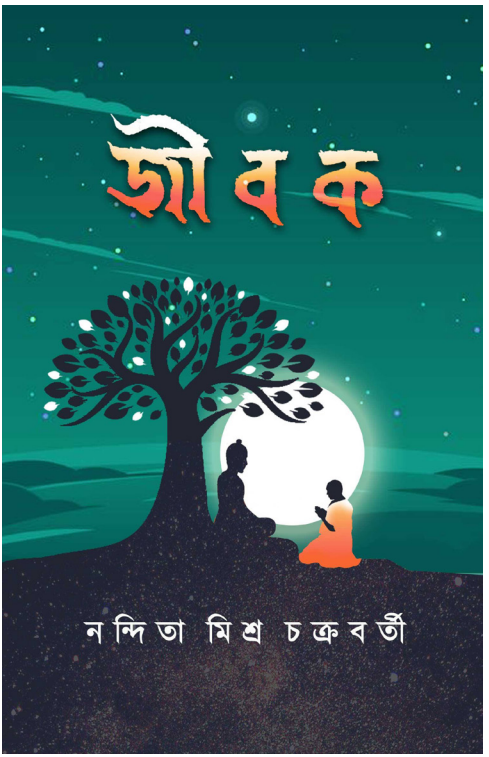

এক রাজপুত্রের এক সামান্য উপপত্নী, যাকে আমরা বলে থাকি বেশ্যা, তাঁরই এক গর্ভজাত সন্তান এই জীবক, যাকে

জন্মকালে পরিত্যাগ করেছিলেন তাঁর মা।
বেশ্যার সন্তান সে—কার সন্তান? সে কি জারজ? কে তাঁর পিতা?
সে তো একমাত্র জানে তার মা-কে।
সেই সদ্যোজাত সন্তান ধীরে ধীরে বড়ো হতে লাগলেন। এ পৃথিবীতে একমাত্র প্রকৃতি আর গাছপালা, বনানী ছাড়া কাওকেই তাঁর আপন মনে হয় না।
এরপর নিজের জ্ঞান, অধ্যবসায় দিয়ে হয়ে উঠলেন সেই সময়ের একজন সেরা চিকিৎসক। দেশ থেকে বিদেশ জুড়ে যাঁর খ্যাতি। কোশলরাজ সহ যে কোন রাজা-রাজড়াদের ভিতরকক্ষ পর্যন্ত তাঁর আনাগোনা।
কী ভাবে?
আবার, ক্ষমতার শীর্ষে থাকা সেই সব রাজা-রাজড়াদের সখ্য জীবক বসে থাকেন বুদ্ধের পদতলে তাঁর একটু করুণার আশায়, একটু জ্ঞানের আশায়। বৃদ্ধ বুদ্ধের চিকিৎসা করেন তিনি।
শুধু জীবক নয়, জীবক এবং বুদ্ধকে কেন্দ্র করে সেই সময়ের প্রেক্ষাপট—কোশল, প্রসেনজিৎ, অজাতশত্রু, দেবদত্ত, হিংসা, কূট রাজনীতি, অবিরত রক্তপাত যেমন উঠে এসেছে, তেমনি উঠে এসেছে বুদ্ধের সংস্পর্শে এসে সেই সব মানুষদের বদলে যাওয়া জীবন। পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য হাহাকার।

উপন্যাস আকারে এক জ্বলন্ত সময়ের দলিল পেশ করেছেন লেখিকা নন্দিতা মিশ্র চক্রবর্তী
প্রচ্ছদঃ কুশল ভট্টাচার্য

শীলভদ্রের প্রকাশ উপলক্ষে

প্রত্যেক পাঠক, বিক্রেতা, এবং অনলাইন

সেলারদের জন্য তিনদিন ধরে চলবে বিশেষ

আকর্ষণীয় ছাড়

তা আমরা পরবর্তী পোস্টে ঘোষণা করব

প্রধান পরিবেশক